Vol. 29 | No. 3 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

‘বারমাস্যা' বা বারমাসী-সাহিত্য

Volume	29
Issue	3
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রাজিয়া সুলতানা
Published online	June 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i3.3
Pages	91-114
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

‘বারমাস্যা’ বা বারমাসী-সাহিত্য

Check for updates

রাজিয়া সুলতানা

বাংলা সাহিত্যে বারমাসী বলতে আমরা এক বিশেষ ধরনের পদ্য-বন্ধ রচনা বা গান বুঝি, যাতে নায়ক-নায়িকা তাঁদের আত্মীয়-পরিজন, মাতা-পুত্র, ভাই-বোন বা প্রিয়জনের বিচ্ছেদের কথা বৎসরের বারটি মাস অথবা ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যের সঙ্গে একাত্মসুরে ব্যক্ত করে। যুগ যুগ ধরে, বাংলাদেশের সাক্ষর কবি ও নিরক্ষর গায়েন, কথক বা লোকগীতিকা স্রষ্টার বারটি মাস অথবা ষড়ঋতুর বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও লীলা বৈচিত্র্যকে উপবীজীব্য করে, এই বিশেষ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় উপমহাদেশে এবং বাইরের পৃথিবীর প্রাচীন ও আঞ্চলিক সাহিত্যেও কর্মসঙ্গীত, ঋতুকেন্দ্রিক-ধর্ম-গীতি বা Seasonal Songs জাতীয় বারমাসীর নিদর্শন পাওয়া যায়। বিদেশী সাহিত্যের ঋতু-সঙ্গীত বা ‘সিজনাল সংস’ যদিও এক জাতীয় বারমাসী-সাহিত্য, কিন্তু তা ঠিক ভারতীয় সাহিত্যের বারমাস্যা নয়। সেখানে বারোটি মাসের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বা ফসল প্রধান না হয়ে, চারটি ঋতুই প্রধান হয়েছে। সেকারণে, অনেকে মনে করেন, লোকগীতিকার এই বিশেষ ধারাটি এই উপ-মহাদেশের নিজস্ব সম্পদ, ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য। “সংসদ বাংলা অভিধানে” ‘বিরহিনী নায়িকার এক বৎসরব্যাপী সুখদুঃখের কাহিনী সংবলিত কবিতাকে’ বারমাসী বলা হয়েছে। এর কারণ বোধকরি এই যে, নারী-জীবনের আনন্দ, বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাই এর মূল সুর। আবার, কোন কোন বারমাসী হচ্ছে—নারী-পুরুষের সম্মিলিত জীবনের নর্ম, কর্ম ও ধর্মগীতি।

যদিও প্রাচীন, মধ্য, এমনকি আধুনিক যুগেও বারমাসী পাওয়া যায়, কিন্তু বারমাসী সাহিত্যের বীজ উপ্ত হয়েছে দেশের আর্থ-সামাজিক

পটভূমিতে, কৃষিভিত্তিক জন-মানসে। তাই, এ সাহিত্য বেড়ে উঠেছে প্রধানত লোকসাহিত্যের আঙ্গিনায়। ইদানীং বাংলা একাডেমী সংকলিত 'লোকসাহিত্য' পত্রিকার বিভিন্ন খণ্ডে বারমাসীর কিছু কিছু নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

তবে, বারমাসীর প্রাচুর্য পল্লীসাহিত্যে যত, শহরকেন্দ্রিক সাহিত্যে ততটা নয়। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রণীত ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা, দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত বারমাসী এবং অন্যান্য পাণ্ডুলিপির আকারে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বারমাসীর সংগ্রহ-দৃষ্টে জানা যায়, এর অধিকাংশই মধ্যযুগে ও অবিভক্ত বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে। এর কারণ বোধকরি প্রাকৃতিক জীবনের লীলা-বৈচিত্র্য, শস্য-প্রাচুর্য, নদী-মাতৃকতা আর ঝড়-বন্যা-বৃষ্টির অনিশ্চিত আতিশয্য।

লোসাহিত্যে, সাধারণত যে ধরনের বারমাসী পাওয়া যায়, তাকে দুটো পর্যায়ে ভাগ করা যায়---একজাতীয় বারমাসী দীর্ঘ কাহিনী-কাব্যের অন্তর্গত অংশ বিশেষ। অপরটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গান বা কবিতা। বিষয়-বৈচিত্র্যবিচারে, বারোমাসী সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেণী-বিভাগ করা যায়---

ক. আনুষ্ঠানিক বা ধর্মীয় বারমাসী
খ. কৃষি-বারমাসী
গ. বর্ণনা-মূলক বারমাসী
ঘ. বিরহ-মূলক বারমাসী
ঙ. অধ্যাত্ম-সাধনার বারমাসী
চ. পরীক্ষামূলক বারমাসী
ছ ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখমূলক বারমাসী এবং স্বাস্থ্যের বারমাসী

ক. আনুষ্ঠানিক বা ধর্মীয় বারমাসী

এ-জাতীয় বারমাসীর সংখ্যা খুবই কম। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত 'হারামণি' (২য় সং, পৃ. ৪৫, বিভিন্ন খণ্ডে), শূন্য-পুরাণের গদ্য

বারমাসীতে প্রত্যেক মাসের রাশিপূজা ও বরদানের বর্ণনায়, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকায় (৩য় খণ্ড, ২য় ভাগ) বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'লোকসাহিত্য' পত্রিকার বিভিন্ন খণ্ডে (পৃ. ২২৩), সুশীল কুমার দে' (Indian Folk-lore পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৬০) প্রমুখের প্রবন্ধে এ-জাতীয় বারমাসীর নমুনা পাওয়া যায়। এ-জাতীয় বারমাসীতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত 'বিয়ার বারমাসে' বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে বিবাহ শুভ-অশুভ ইত্যাদি যুক্তিবাদী সংলাপ ও শ্লেষপূর্ণ রচনাশৈলীতে ব্যক্ত হয়েছে। এই বারমাসীর সংগ্রাহক সিলেট জেলার চোধুরী গোলাম আকবর। উদাহরণ স্বরূপ অংশ বিশেষ তুলে দেখানো যেতে পারে----

শাওন মাস বিষস মাস
বিয়া নাই সে অয়-----
এই মাসে বিয়া কইরলে সর্বনাশ ঘটয়।
সাওনে অইছিল বিয়া বিপুলা সুন্দরীর
কাল রাইতকুর (বাসর রাতে) মাঝে বেটি
অই গেছিল রাঢ়ি (বিধবা)...
ভাদ্‌রো মাসে শাস্‌তরো মতে
বিয়া শাদী মানা
কিয়োর লাগি মানা কেউ অই জানে না।
দেশ জুড়ি হক্‌কলে মানে
তুমি না মানবায় কিলা
আচার বিচার চল আছে
যেদেশে যেই যিলা (যেরূপ)...

বলা হয়ে থাকে, বারোমাসীগুলি একান্তই নারীজীবনের বিরহ-যাতনার কথা। কিন্তু এই বারমাসী রচিত হয়েছে একটি তরুণের জবানীতে; এ বছর বিয়ে না করার নানা অজুহাত ও কারণ উত্থাপনের ফলে। সুতরাং, এটি হচ্ছে পুরুষের বারমাসী।

আনুষ্ঠনিক বারমাসীর অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, পূজা-পার্বণে, নারী-পুরুষের সমবেত কণ্ঠে, অথবা শুধু "স্ত্রীলোকের মুখে মুখে, অনেক হেঁয়ালীতে বারমাসী থাকে'' (নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, ১৮-শ খণ্ড, 'বাঙ্গালা সাহিত্য' পৃ. ১৭৫)।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' গ্রন্থে, (৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ২২৫) একটি পূজার বারমাসী সংকলন করেছেন। তার অংশ বিশেষ আনুষ্ঠানিক বারমাসীর উদাহরণস্বরূপ তুলে দেয়া যায়।

বৈশাখ মাসে তুলসীরে দিয়া থাকে ঝাড়া।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পূজা আর পূজে তারা।
আষাঢ় মাসে পূজা করে মাতা বসুমতী।
শ্রাবণে মনসা পূজে আরো পড়ে পুঁথি
ভাদ্র মাসে ভদ্রকালী কৈরে থাকে পূজা।
আশ্বিন মাসেতে পূজে দেবী দশভূজা॥
কাতিক মাসেতে আশ্বিনের পানি ভাত খায় (গাসিপূজা)
আঘ্রাণে থাকে নারী সন্ন্যাসী সেবায়।
পৌষমাসে পূজা করে চন্দ্র হেন দেবায়॥
মাঘ মাসে সূর্য পূজে দিয়া রক্তপূজা॥
ফাল্গুন মাসে গোবিন্দের দোলায় যে দোলে।
চৈত্রমাসে চড়কপূজা আর সন্ন্যাস গাছ তোলে॥

গৃহারম্ভ বা গৃহ-নির্মাণ-সংস্কারবিষয়ে প্রচলিত লোকবিশ্বাস বিভিন্ন মাসের লক্ষণ বা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও তা পূজা-বারমাসী বা 'বিয়া-বারমাসী' থেকে ভিন্ন। বিশ্বকোষ রচয়িতার মতে, (নগেন্দ্র নাথ বসু, ১৮-শ ভাগ, ১৩১৪ কলিকাতা, পৃ. ২৫১) "বৈশাখ মাসে গৃহারম্ভ করিলে ধনরত্ন-লাভ, জ্যৈষ্ঠ মাসে মৃত্যু, আষাঢ়ে ধনরত্ন-লাভ শ্রাবণ মাসে কাঞ্চন ও পুত্র-লাভ, ভাদ্রমাসে অশুভ, আশ্বিনমাসে পত্নী-নাশ, কাতিক মাসে ধনধান্যাদি লাভ, অগ্রহায়ণ মাসে অন্নবৃদ্ধি, পৌষমাসে চৌরভয়, মাঘমাসে অগ্নিভয়, ফাল্গুন মাসে ধনপুত্রাদি লাভ, এবং চৈত্রমাসে পীড়া হইয়া থাকে।" বৎসরের বিভিন্ন মাসে গৃহনির্মাণ শুরু করার পশ্চাতে প্রাকৃতিক কারণ যেমন ক্রিয়াশীল,

তেমনি ঋতুগত প্রভাবও অনস্বীকার্য বলে বিশ্বকোষ-রচয়িতা অভিমত প্রকাশ করেন।

খ. কৃষি-বারমাসী

বর্তমান যুগে, মানুষের জীবন জড়বিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞান-নির্ভর এবং অহর্নিশি ব্যস্ত। বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগে, যখন 'বাঙ্গলাহ্' 'বঙ্গ', 'পুণ্ড্র বর্ধন', 'বরেন্দ্র' 'রাঢ়', লক্ষ্মণাবতী 'সমতট', 'গৌড়', প্রভৃতি ভূখণ্ডের সম্মিলিত বৃহৎ ভূখণ্ড-এর কয়েকটি দেশের মিলিত অঙ্গ বা অংশ বিশেষকে 'বঙ্গদেশ' বোঝাতো, তখন থেকেই বাঙ্গালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা নিয়ে 'বারোমাসী'র ছড়া সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে, মধ্যযুগের সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ এর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এযুগের সাহিত্যে বারমাসীর বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষতা লাভের প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, তখন মানুষ ছিল প্রধানত প্রকৃতি-নির্ভর। কৃষি-কেন্দ্রিক সেই যুগে, মানুষের প্রধান অবলম্বন ছিল মাটি, সময়মতো ফসলের উপযোগী বৃষ্টি, শিশির, রৌদ্র, পুষ্প, শাকশব্জী, ফলফলারি ও গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ খাদ্য এবং ভেষজ-সম্পদ। শস্য-উৎপাদনের জন্য কিষাণ-কিষাণী যে যে মাসে যে যে কাজ করে থাকে, সে বর্ণনাই কৃষি-বারোমাসীর মূল কথা। ফাল্গুনে কৃষকের ভূমিকর্ষণ, চৈত্রে ফসল বোনা, বৈশাখের সবুজ ধানের ক্ষেতে 'রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি খেলা' আষাঢ়ে পাকাধানের সোনালী সমারোহ, ইত্যাদির সহজ-সরল বর্ণনাই কৃষি-বারমাসীর প্রধান আকর্ষণ। 'ডাক' ও 'খনার' বচনের সঙ্গে এ-বারমাসীগুলির সাদৃশ্য রয়েছে।

'কৃষি বারোমাসী'র একজাতীয় নিদর্শন দীনেশচন্দ্র সেনের 'History of Bengali language and literature' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। 'ময়মনসিংহ জেলার 'সৌরভ' পত্রিকায় (১৯২৭ খৃীঃ ১০-ম সংখ্যা, পৃ. ২৬৪) পাট বা 'নলিতার বারোমাসী'কেও এ পর্যায়ভুক্ত করা যায়। এই বারমাসীর পরিচিতি অংশে শ্রী সুধাংশুভূষণ রায় বলেন: "অন্যান্য ফসলের চেয়ে পাটচাষের শ্রম, অনিশ্চিত অর্থাগমের সংশয়-সঙ্কট, অনেক বেশী"। দুরূহ কাজে কৃষকের কঠিন পরিচিতির কথা, ময়মনসিংহের

আঞ্চলিক ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। বারমাসীটির বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিমাসের শেষে, একই ধুয়া বারবার দিয়ে, পৌষমাসে থেকে বর্ষের (পাট-উৎপাদন) সূচনা ঘোষণা করা :

আমার সারা শরীর কালা হৈল ও ভাই
পাট বুনিতে।পাট বুনিতে।।
পৌষ না মাসেতে ভাইরে পুষ্প অন্ধকারী
নাইল্যার লাইগ্যা গিরস্তেরা না লয় ঘরবাড়ী।।
দিশা নিল কে শরীর কইরলাম কালা রে,
ভাই নাইল্যারে নিড়াইতে।
মাঘ না মাসেতে ভাইরে ক্ষেতে নিলাম মই।
দূর্বায় ভেদাল্যায় (এক প্রকার বুনো লতাপাতা) কয়
আমরা যাইবাম কই।।
চৈত্রি না মাসেতে ভাইরে রবির বড় জ্বালা।
নাইল্যা ক্ষেতে গোবর ফেইল্‌তে শরীর কইরলাম কালা।।
বৈশাখ মাসেতে ভাইরে নাল্যার ফাললাম আলি।
নাল্যা বেইচ্যা কিন্যা আনলাম ভাউজের কানের বালি।।
নাল্যা যে নিড়াও তুমি ধানত নিড়াও না।
গোস্যা কইর‍্যা বইয়া থাক্‌বাম ভাত রান্‌বাম না।।
জ্যৈষ্ঠি না মাসেতে নাইল্যার আইল্যা (ঢলে) পড়ে আগা,
নাইল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম ভাউজের লাগ্যা তাগা।
আষাঢ় মাসেতে ভাইরে গাঙ্গে নয়া পানি।
হউরীর (শ্বাশুড়ীর) আগে বৌ-এ কয় নাইয়র যাইবাম আমি।
শাওন মাসেতে ভাইরে নাইল্যার লইল ফুল।
নাল্যা বেইচ্যা কিন্যা আনবাম ভাউজের লাগ্যা নাকুল (নাক-ফুল)।
ভাদ্র মাসেতে ভাইরে নাল্যার লগে সই আ'লি (সখীপনা)।
নাল্যা বেইচ্যা আনবাম ভাউজের লাইগ্যা বালি।।
নাকুল (নাকফুল) দিলা যেমন তেমন বালি দিলা ভাঙ্গা।।
তোমার ঘাড়ে ঠ্যাং থুইয়া আমি বইবাম হাঙ্গা (নিকাহ)।।
আশ্বিন মাসেতে ভাইরে পাটের অইল ভাও (শৃঙ্খলা)।
পাট বেইচ্যা গিরস্তেরা কিনল দৌড়ের নাও (নৌকা)।।

কাতিক মাসেতে ভাইরে পাটের করলাম ঠাট (বিন্যাস)
ছয় দেউড়ী ছাড়াইয়া ভাউজে লাড়ত যায় পাট॥
অঘ্রাণ মাসেতে ভাইরে সবে নয়া খায়।
নাইল্যা বেচার যত টাকা খাজনা ফাজনায় যায়॥

পাট-উৎপাদনে কৃষকের গৃহকর্ম, সুখস্বপ্ন ও দুঃখভোগ আলোচ্য বারমাসীর প্রতিপাদ্য হলেও দেবর-ভ্রাতৃবধূর গৃহগত সৌজন্য ও প্রীতির সম্পর্ক অনাবিল সৌন্দর্যে উপস্থিত। আলোচ্য বারোমাসীতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য তথা হাওর বিল-জলাভূমিতে যানবাহনের অভাবে পাটচাষীর জলযানের নির্ভরতা, বিপন্ন-মানসিকতা এবং স্থৈর্যের অভাব প্রকাশ পেয়েছে একটি চরণে—

পাট বেচ্যা গিরস্তেরা কিনল দৌরের নাও (নৌকা)।

বোঝা যায়, এ-অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান সারা-বৎসর জলমগ্ন থাকত; তাই, ধান কিংবা অন্য কোন অর্থকরী ফসলের পরিবর্তে পাট-সম্পদ-নির্ভর ছিলো কৃষকের জীবন। এই পাট-উৎপাদনের ভালো-মন্দেই তাদের হৃদয় আনন্দ-বিষাদে পূর্ণ হতো, ঘরে ঘরে আবাল-বণিতা-বৃদ্ধা—সকলের বাৎসরিক সাধ-আহ্লাদ মিটানো এর ওপর নির্ভর করতো। কৃষিবিষয়ক আর একটি বারমাসীতে ফসলের বিবর্তনের কথা ব্যক্ত হয়েছে—

কাতিক মাসেতে হায়রে ধানে হৈল ক্ষীর।
তোমার লাগিয়া বধূ মন নহে স্থির॥
অঘ্রাণ মাসেতে ধান উঠিল পাকিয়া।
কোনাই গেলা তুমি মোরে একেলা রাখিয়া॥

[কুমিল্লা জেলার লাকসাম অঞ্চলে প্রাপ্ত]

আবার, বৃষ্টির আগমনে বা তিরোভাবে কৃষির নির্ভরতা 'খনা'র বচনেও লক্ষ্য করা যায়। এরূপ একটি বারমাসী সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। বারামাসীটির সংগ্রাহক শ্রীমতি চন্দনা ঘোষ। তিনি এটি তাঁর স্বগ্রাম ঢাকা জেলার মনোহরদিতে, জনৈকা বর্ষিয়সীর মুখে শুনেছেন। বারমাসীটি নিম্নরূপ:

যদি বর্ষে আঘনে।
রাজা যান মাগনে॥
যদি বর্ষে পৌষে।
কড়ি হয় তুষে॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।
ধন্যি রাজার পুণ্য দেশ॥
যদি বর্ষে ফাগুনে॥
চীনা কাওন দ্বিগুনে॥
যদি বর্ষে চৈতের কোনা।
গেরস্ত বৌর কানে সোনা॥
যদি ঝরে কাত্তি (কার্তিক মাসে)।
সোনা ঝরে রাত্তি (রাত্রিতে)॥
কাতিকের ঊন জলে।
খনা বলে দুনো ফলে॥

গ. বর্ণনামূলক বা আখ্যান-প্রধান বারমাসী

এ-জাতীয় বারমাসীতে কাহিনী-বর্ণনাই প্রধান, বারো মাসের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনা গৌণ। নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদের বেদনা এক একটি মাসের আগমনে কি রূপ ধারণ করে, এ-বারমাসীতে তাই বর্ণিত হয়। লোক-বারমাসীগুলির অধিকাংশ এই গোত্রভুক্ত। এ জাতীয় বারমাসী ময়মনসিংহ গীতিকার ‘মহুয়া’ ‘দেওয়ান ভাবনা’ ‘কঙ্ক ও লীলা’ প্রভৃতি লোকগাঁথায় রয়েছে। এ পর্যায়ভুক্ত বারমাসীগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, একাত্ম। বারমাসী বাদ দিয়ে কাব্য-পাঠ করলে কাহিনীর যোগসূত্র রক্ষিত হয় না। মহুয়ার সন্ধানে ‘নদের চাঁদ’ বৈশাখ থেকে চৈত্র অবধি দেশ-দেশান্তরে যদি না বেড়াত, তবে তার দয়িতার খোঁজ পেত কিনা সন্দেহ। কাহিনীর গতিও অন্যদিকে বাঁক নিত।

ঘ. বিরহ বা বিচ্ছেদ-বর্ণনামূলক বারমাসী

বারমাসীর মধ্যে যে সুর সর্বাপেক্ষা প্রধান, তা নরনারীর, বিশেষ করে নারী-জীবনের দুঃখ-বেদনা। বিভিন্ন মাসের নিসর্গের পটভূমিতে

প্রতীক্ষাকাতর নারীর বিরহ-যাতনা বারমাসী সাহিত্যে বিরাট স্থান জুড়ে আছে। এ-বিরহ কখনো স্বামীর জন্য, আবার কখনো প্রিয়জনের জন্য। মহাকবি আলাওলের কাব্যে নাগমতীর বিরহ, শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা'য় জোলেখার বিরহ, দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খানের 'লায়লী মজনু' কাব্যে 'মজনুর খেদ' সৈয়দ সুলতান রচিত 'নবীবংশ' কাব্যে বিবি হাওয়ার বিরহ-গীতি, সৈয়দ মুহম্মদ আকবর বিরচিত 'জেব্‌ল মূল্‌ক শামারোখ' কাব্যে শামারুখের বারমাসী, ইত্যাদি এ-পর্যায়ের রচনা।

সৈয়দ মুহম্মদ আকবর রচিত জেব্‌ল মুল্‌ক শামারোখ কাব্যে প্রাপ্ত এ-জাতীয় একটি বারমাসীর অংশ-বিশেষ তুলে দেখানো যেতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, এই কাব্যের বারমাসী অংশটি এর পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এই কাব্যের বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রয়েছে :

বন্দী ঘরে থাকি শামা পন্থ পানে চায়।
কুমারের বিরহ ভাবে বারমাস গায়।
প্রথম ফাল্গুন মাসে বসন্ত উদয়॥
চিকুরের নাদ শুনি জীবন সংশয়।
দক্ষিণে পবন বহে দাউদী বিকল।
বন্ধু বিনে বিরহিনী ভক্ষিব গরল।
চৈত্রল মাসেতে সখি রবির বড় জ্বালা।
ভাবি বন্ধুর কারণে শরীর হৈল কালা।
শুতিলে না ধরে নিদ্রা বসিলে পোড়ে হিয়া।
জীবন তেজিল সত্য ঘুষিয়া ঘুষিয়া॥
বৈশাখ মাসেতে সখী সব পুষ্পময়।
সুগন্ধীর গন্ধ মোর শরীরে না সয়॥
একেশ্বর বঞ্চিবারে আছিল কপালে।
ইচ্ছা হৈল প্রাণী যে ঝাম্প দিয়া জলে॥
জ্যৈষ্ঠেতে রবির তাপে শরীর বিকল।
সমুদ্রেতে ঝাম্প দিলে না লাগে শীতল॥
একেশ্বর থাকি আমি নাহিক দোসর।
এবেঁত দুষ্ট বন্ধুর না আইল খবর॥

আষাঢ়ে নিদাঘ রীত গগনে গর্জএ।
আঁখিতে না আইসে নিদ্রা চমকি উঠএ।।
এমন দুঃখের কালে নাহি বন্ধুজন।
কাহারে কহিব আমার দুঃখের বচন।।
শ্রাবণে গগনে মেঘে বরিখএ নীর।
নয়ানের স্রোতোজলে ডুবিল শরীর।
আহারে পাপিষ্ঠ প্রিয় না দেখাইল মুখ।
শিশুকালে প্রেম করি এত দিল দুখ।
ভাদ্রের সম্পূর্ণ কূলে জল টলমল করে।
না জানি পাপিষ্ঠ জলে কারে ডুবাই মারে।
বাহিরে বরিষার জল ঝরে আঁখির পানি।
একতিল না দেখিএ শুকনা মেদিনী।
আশ্বিনে কুমুদ পদ্ম যুগল কিশোর।
মধুলোভে মত্ত হৈআ গুঞ্জরে ভ্রমর।
শুনিতে না পারি আমি চাতকের নাদ
এ ছার জীবনে মোর আর নাহি সাধ।।
কার্তিকে শীতল রীত শরতের শশী।
একাকিনী থাকি আমি অন্ধ কূপে বসি।
বিরহের ঘাও যেন বিষম কাটারী।
নারী হৈয়া কোথা দুঃখ রাখিমু সম্বরী।।
আঘ্রণে অঙ্কর শীতের উত্তরের পবন।
দুঃখের উপরে দুঃখ না যায় সহন।
পুরাইল যৌবন কলা কাম গেল বহি।
কাম বিনে কামিনী কেমনে রহি সহি।।
পৌষে অন্ধকার নিশি হেমন্তের রীত।
বিরহে উদাস হৈআ পড়িল ভূমিত।।
দণ্ডেক মাসেক যায় দিবসে বচ্ছর।
এবেঁতো না আইল দুষ্ট মগদের খবর।
মাঘল মাসেতে পূর্ণ হৈল বারমাস।
এবেঁ না পুরাইল আল্লায় মোর মন আশ।।
জায়ার যাতনা বৈরী তাহে একেশ্বর।
নির্বান্ধব রৈছি আমি মিনারের ভিতর।।

এমন বান্ধব নাই বন্ধু স্থানে যায়।
বিরহিনীর যত দুঃখ কহিআ বুঝায়॥

[সৈয়দ আকবর---'জেবুল মুলক শামারোখ', অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি; নং, ঢা. বি. ক্রমিক ১৩৫ পৃ. ৭৪]

সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে বাংলা সাহিত্যের এই প্রণয়কাব্যের ধারায় বারমাসীর যে বিশিষ্টতা সৃষ্ট হয়েছিল, তার গঠন-শিল্প তৈরী হতে দুয়েক শতাব্দী কেটে যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কাব্যে রাধার বিরহবর্ণনায় বৎসরের বার মাসের কালানুক্রমিক ধারায় বর্ণনা স্থান পায়নি, পরিবর্তে দুই চার মাসের—আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনের—উল্লেখমাত্র রয়েছে। তবে, লোকসাহিত্যের বাইরে শালীন কাব্য সাহিত্যের এটি প্রাচীনতম লক্ষণ এবং বারমাসীর পূর্বাভাষ, একথা বোধ হয় বলা যায় (দ্র. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥ রাধা-বিরহ-খণ্ড)।

যদ্দুর জানা যায়, বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে কৃষ্ণের বারোমাসী তেমন একটা পাওয়া যায় না ; পাওয়া যায় কেবল 'রাধার বারমাস'। এই জাতীয় বারমাসীর অনেকগুলি খণ্ড-কবিতার আকারে, এবং অধিকাংশই নারীর জবানীতে স্ত্রী বা দয়িতা কর্তৃক প্রেমাস্পদ বা স্বামীর উদ্দেশে রচিত। কেবলমাত্র 'মজনুর খেদ' নামে বারমাসী এ-ধারার ব্যত্যয়ধর্মী কবিতা, যেখানে নায়কের মনোবেদনাকে কবি বারোমাসীর আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন।

শুধু স্বামী, উপকান্ত, দয়িতা বা স্ত্রীর জন্য বিরহ-মূলক বারমাসী রচনায় কবিপ্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করেছে, তা নয়, এমন বারোমাসী বাংলা সাহিত্যে আছে যা সপত্নীর বারমাসীর তীব্র হিংসা-মাৎসর্য---ইত্যাদি প্রকাশ করেছে। যেমন খুল্লনার বারমাসী। আবার, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র বা নিকটতম আত্মীয়ের বিচ্ছেদ, প্রবাস বা বিয়োগেও বারমাসী রচিত হয়েছে। যেমন--মায়ের জবানীতে 'নিমাই চাঁদের বারমাসী' (মু. আশরাফ হোসেন কর্তৃক সিলেট থেকে সংগৃহীত এবং বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত)। জননীর ভাষ্যে, পুত্রের শোকে রচিত 'আসগরের বারমাসী' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষিত পুঁথি নং ১৫১) পিতার শোকে রচিত 'মুসলিমের পুত্রের বারমাস'।

'মুসলিমের পুত্রের বারমাসী' একটি ব্যতিক্রমধর্মী বারোমাসী; বারমাসীটি দুটি শিশুপুত্রের জবানীতে অভিনব ভঙ্গীতে রচিত। দুটি পিতৃহারা অবোধ বালক তাদের বাবা'র অকাল-বিয়োগে বারমাসীর নির্মাল্য গ্রন্থন করেছে:

চৈত্র মাসে পত্র পাই যাইতে কুফার শহর।
কান্দি মরি বাবাজী আমরা দুইভাই একেশ্বর॥
বাপ ছাড়ি আমরা গাই সদা রাব্বুল আলামীন।
শয়নের ঘর নাই আমরা দুই ভাই হৈছি এতিম।
বৈশাখ মাসে আমরার গেরাম ভাইঙ্গছে নদীতে।
ভাঙ্গনেতে জাতি ফাডে কালি হৈলাম রৌদ্রেতে॥
বাড়ী ভাঙ্গি চাল ফাটি কি কইরলো সাগরে রে...
খোদা তুমি দেখঅর না বুঝিরে॥
আইল জ্যৈষ্ঠ মাস মিণ্ট এই আম কাটুল সার।
মায়ের বাপের সঙ্গে দুধভাত ন খাইউম আর॥
আইয়ো চাচা আমীর হোসেন ভাতিজার খবর লেও।
তোমার ভাইর লাগি কোরান পড়ি দোয়া দেও॥
আষাঢ় মাস জননীর কোলে আর না গেলাম দুই ভাই।
না জানি মোরার কথ দুঃখ আছে ছাই॥
আহারে আল্লা মোদের ফরিয়াদ জানা নাই॥
ফলে ফুলে জড়ে কাল যমেতে যমেতে কাটিল চাঁই
(বাঁশের তৈরী মাছের ফাঁদ)॥

সাহরবানুর পুত্র 'আসগরের বারমাসী'তে অনুরূপ পুত্রশোকাতুরা জননীর বেদনার ভাষা মূর্ত হয়েছে---

পরথম কার্তিক মাসে বাছা গেল রণে।
না জানি কি হৈল বাছার সদা উঠে মনে॥
জোড় মন্দির সোনার পালঙ্গ খালি রৈল পড়ি।
কোথা রৈল আসগর আলি জননীরে ছাড়ি॥
অঘ্রাণ মাসের দিনে ঘরে নয়া অন্ন নতু।
যার ঘরে ভাগ্য বাছা খায় ঘৃত মধু॥

সকলের ভাগ্যে বাছা খেজুর-রস থাকে।
অভাগা নিধনিয়ার ভাগ্যের মাস বলে তাকে॥
পৌষল মাসের দিনে দুনা দুঃখ বাড়ে।
ঘর ছাড়িয়া আসগর আলী রহিল বাহিরে॥
জোড় বাংলা ফুলের শয্যা তখ্‌ত রৈল খালি।
মারে ছাড়ি অনাথ করি কোথা ছাপালি॥
মাঘের দিন হৈল ভীম বাছা নাই মোর ঘরে।
সকলের যাদু বাছা থাকে মায়ের কোলে।
চন্দ্রমুখ আজগর আলী কোথায় ছাপাইলে॥
ফাল্গুন মাস কুকিলায় কুহরে রাত্রিদিন।
মুদিয়া মা'র নয়ান যাদু করিলা ভিন্॥
রাত্রিতে সায়ান কৈলুঁ নিদ্রা আসিবারে।
স্বপনেতে আজগর আলী মা-মা ডাকে মোরে॥
চৈত্র মাসে নানা পুষ্প বিকশিত হৈল।
পুষ্পে পুষ্পে অলি আসি ফুলে মধু খাইল॥
ভোম্‌রা ভোমরী আসি ডাকিয়া কহিল।
হেনপুত্র সাহরবানুর কোথাতে রহিল॥
বৈশাখ মাসের দিনে রৌদ্র অঙ্গ হরে।
সাহরবানু ঝাম্প দিমু অকূল সাগরে।
গভীর সাগর বলি ঝাম্প দিলুঁ জলে।
শোকে অগ্নি জ্বলি উঠে আমার কপালে॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট মেমা (মেওয়া) গাছেত পাকায়।
ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী আসি গাছের মেমা খায়॥
কাকাতুয়া ত্বরা আসি ডাকিয়া কহিল।
হেনপুত্র সাহরবানুর কোথাতে রহিল॥
আষাঢ় মাসের দিন জল স্থল সাগরে।
মেঘের গর্জন পর্বতের শিখরে শিখরে॥
মেঘ হৈল অন্ধকার নিরলে বর্ষিল।
মরিবার কালে আজগর পানি না পাইল॥
শ্রাবণ মাসের দিন বরিষা হৈল ভারি।
সাধু সদাগর আইল সে আপনার বাড়ী॥

তেকারণে মুঞি রৈলুম পন্থ নিরখিয়া।
যেবা আইসে অরে পুজি আজগর আইছে নিয়া॥
ভাদ্র মাসে গঙ্গার জলে পড়ি গেল চর।
পুত্র যদি আসে নিকটে কিসের বাড়ী ঘর॥
ইষ্ট নাই পুত্র নাই নাই দোসর ভাই।
মরিলে তালাশি করিত আর কেহ নাই॥
আশ্বিন মাসের দিন পূরাইল বারমাস।
শহরবানু পুত্রযোগী না পুরিল আশ॥
স্বপনেতে আজগর আলী মাও মাও বলে।
সাহরবানু পুত্র শোকে বালিশ লৈল কোলে॥
[অপ্রকাশিত; ঢা. বি. পাণ্ডুলিপি বিভাগে প্রাপ্ত]

নোয়াখালী জেলার ফেনী অঞ্চলে প্রাপ্ত 'গুলবানুর আর আশরাফ মুনশীর' এই বারমাসীতে 'কোম্পানীর' যুগে, অর্থাৎ বৃটিশ শাসনের শুরুতে শিকারপ্রিয় জনৈক স্বামীর বিয়োগে তার স্ত্রীর বেদনা-বিধুর হৃদয়ার্তিকে উপজীব্য করে কবি বারমাসী রচনা করেছেন। গানটি এযুগেও মেয়েলী গীতরূপে এতদঞ্চলে প্রচলিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি বিভাগে এই বারমাসীর একটি প্রতিলিপি পাওয়া যায়, বারমাসীটি নিম্নরূপ:

খাজনার কারণে জাগা কোম্পানী নিলামে যায়।
শ্রাবণ মাসে আশরাফ মুনশী হৈল দূরান্তর॥
দিবা নিশি তোমার ভাবে অঙ্গ জর জর।
হুজুর রৈল দূরে প্রাণ কাম্পে থর থর॥
ইষ্ট কুটুম ভাই বন্ধু সকল হৈল ফর (পর)।
ভাদ্র মাসে আশরাফ মুনশী বরিষা হৈল নিবর (নিবারণ)॥
হেন সাধ করে মনে সমুদ্রে ডুবিতাম।
আম্মি নারী অভাগিনী নানা দেশ ভরমিতাম॥
যুগিনীর বেশ ধরি ভরমি তোঁআর শোগে।
জহর খাই প্রাণ মোর তেজিমু এই দুঃখে।
কাতিকেতে আশা গেল দুক্ষ না হৈল শেষ।
স্বর্গেতে গেলা মুনশী গায়েব হৈলা পরদেশ॥

আঘ্রাণ মাসে আশরাফ মুনশীএ নয়া নবীন খাইলা।
না বুঝিয়া সাপ হরিণ শিকারেতে চলিলা॥
শিকারেতে যাইয়া মুনশী নিজ প্রাণ তেজিলা।
শোওহর গুলবানু কইন্যা সাগরে ডুবাইলা॥
পৌষ মাসে আশরাফ মুনশী বহে হৈমন্তী রীত।
হাম্ নারী অশ্বরী (একেশ্বরী) জায়ায় ধইরলো চিত॥
সন্ধ্যাকালে শয্যা ঢালি শয্যা কারে দিলা।
শয্যা মাঝে ফইড়া মরি মুঞি গুলবানু একেলা॥
গুলবানু কান্দন করে বুকে মারি বজ্রাঘাত।
এই রূপ-যৌবন মোর কই বিলামু প্রাণনাথ॥
বসন্তের রাত্র প্রাণ সদায় উদাস।
কান্দি কান্দি আশরাফ মুনশী এহি ফাল্গুন মাস॥
চৈত্র মাসে আশরাফ মুনশী বনে হৈল খুন।
হুজুরের থানাদার আসি জানাইল সেই আগুন॥
সর্বজনের স্ত্রীপুরুষে মাতাব্বর বারীত (বাড়ীতে) নি।
জবানবন্দী দিলেন্ত তার কিছু না জানি॥
বৈশাখ মাসের পন্থ দেখি গুলবানু করে কান্দন।
মরি গেলা মুনশী যাহার না হই দরশন॥
সব মরি গেলা সাধুর কি গতি হৈব আর।
কিরূপে পালন হৈব নাবালক জাদু তোমার।
জ্যৈষ্ঠ মাস আশরাফ মুনশী না ছুঁই গাছের গোড়া (আম-কাঁঠাল)
জঙ্গলে হৈলা সয়লাব পন্থে না হৈল শকতির।
জঙ্গলে নিধন হৈলা ফিরি না আসিলা যুগতির (যুবতী ?)॥
কান্দি কান্দি গমাইলা অভাগী দাসী তোমার।
আষাঢ় মাস আশরাফ মুনশী প্রাণ হৈল নৈরাশ।
নিত্য কান্দে দাসী তোমার ঘরে করি বাস॥
জগৎ ভাসিয়া গেল কোম্পানীর ডরে, উফায় নাই আর।

বারমাসীটি গতানুগতিক ধারায় রচিত নয়। বারমাসীর প্রথাবদ্ধ নিয়মে আহার্য, শীতের প্রকোপে দেহার্তি, বিচ্ছেদ-কাতরতা, বা ফলফুল সম্ভার স্মরণ করে কান্ত-বিরহের বর্ণনা এখানে প্রদত্ত হয়নি। প্রতীক্ষার হতাশা, বসন্ত-বায়ুর সঙ্গে দয়িতার দীর্ঘশ্বাস এখানে একাকার।

জীবিকার জন্য পার্বত্য-উপত্যকা-নদ-নদী-বেষ্টিত শ্বাপদ-সঙ্কুল গিরিযাত্রাই গুলবানুর দয়িতকে শেষ পর্যন্ত গ্রাস করলো। অরণ্য-সম্পদ, বাঁশবেত, মূল্যবান কাঠ ও পশুপক্ষী সংগ্রহকারী শিকারী মানুষ এখানে নিজেই অরণ্যের শিকারে পরিণত। এরা উপজাতীয় নয়, জাতি ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালী। কিন্তু পাহাড়-প্রান্তিক জনপদে অবস্থানের জন্য এ-অঞ্চলের মানুষকে শিকারীর বিপদসঙ্কুল জীবন ও অনিশ্চিত জীবিকা বেছে নিতে হয়েছে।

রাধাকৃষ্ণের বিরহ-বর্ণনায় অধিকাংশ কবি বৈচিত্র্য-সৃষ্টিতে তেমন সফলকাম হতে পারেননি---

"কান্দ্যা কান্দ্যা বলিতেছে শ্রীমতি রাই।
আন্যা আন্যা দে মোর নাগর কানাই॥ ধুআ॥
শুন আএ বৃন্দা দূতী বলি তোমারে।
মথুরায় গেল হরি আন্যা দে মোরে॥
শ্যাম বিনে ব্রজপুরে আমার ব্যথিত নাই।
সেই সে মনের দুঃখ আমি কৈব কার ঠাঁই॥
প্রেমানলে দহে মোর হৃদয় অন্তরে।
বৃন্দাবনে বসি দেখ কোকিল কুহরে॥
কে হরিল প্রাণদূতী ব্রজের শশী।
বৃন্দাবনে রাধা বল্যা ডাকে না বাঁশী॥
ধ্যানে ভজ নাগর কানাই কান্দনা শ্রীমতি রাই।
অভাগী রাধারে থুইয়া শ্যামের মনে নাই॥
কহে শ্রী করম আলী শুনগো প্যারী।
নিকটে আছে তোমার প্রাণের হরি॥

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি বিভাগে সংরক্ষিত, নাম ও ভণিতা বিহীন]।

ঢাকা জেলার মীর্জাপুর গ্রামের শ্রীমতি নীলিমা চন্দ প্রদত্ত এবং আধুনিক কালেও প্রচলিত একটি বারমাসীতে আমরা দেখি, রাধা-কৃষ্ণের লীলার এই বারমাসীর ঐতিহ্য অতি সুপ্রাচীন। বারমাসীর ছক

ও ধারাক্রমে তা রচিত হয়েছে। দু' চার চরণ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে---

মাঘেতে মাধব করে মথুরা গমন।
কৃষ্ণ বিনে অন্ধকার সব বৃন্দাবন॥
ফাল্গুনে ফাগুয়া খেলা গোলক যাত্রা তাতে।
কৃষ্ণ নাহি বৃন্দাবনে খেলি কার সাথে॥
চৈত্রে চাতক ডাকে পিউ পিউ স্বরে।
কৃষ্ণের কারণে চিত্ত ধক্ ধক্ করে॥
বৈশাখে রবির তাপ কি ভীষণ প্রবল।
কাহার অঙ্গ পরশিয়া হৈব শীতল॥
জৈষ্ঠ্যের যমুনা জলে করি জলকেলি॥
কাহার অঙ্গে দিব আমি জলের অঞ্জলি!
আষাঢ়ে আসিবে কৃষ্ণ আশা ছিল মনে।
একদৃষ্টে চেয়ে থাকি যমুনার পানে।
ভাদ্রতে ভরা নদী অকূল পাথার।
কেমনে আসিবে কৃষ্ণ না জানে সাঁতার॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা এ তিন ভুবনে।
নিশ্চয় আসিবে কৃষ্ণ, দুর্গোৎসব দিনে॥
কার্তিকে কাননে কানু চড়াইত ধেনু।
রাধা রাধা বলি কৃষ্ণ বাজাইতেন বেণু॥

ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে আপন স্বামী ও তাঁর জীবিকার সুযোগ-সুবিধার কথা তুলনা করে এক নারী তার ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা ব্যক্ত করেছে এক বারোমাসীতে---

বারা মাস পূর্ণ হলো নারীর সাধু দেশে আ'লো
এলো সাধু রলো কার বা মন্দিরায় হারে মন্দিরায়।
চাকুরে সোয়ামী যার এনা দুষ্কের কপাল তার॥
বচ্ছর অন্তে একদিন আসে নারীর মন্দিরায়।
হারে এই মন্দিরায়॥

জাল্যাচাষী স্বামী যার, কিনা সুখের কপাল তার।
সন্ধ্যা লাগলে আস্যা বসে নারীর মন্দিরায়।
হারে মন্দিরায়॥

[মুহম্মদ মন্‌সুরউদ্দীন সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'হারামণি' ১৩৩৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২]

ভ্রাতা, পুত্র বা নিকট-আত্মীয়ের বিচ্ছেদ বা বিয়োগ-জনিত বারো-মাসী ইদানীং বড় একটা সংগৃহীত ও প্রকাশিত না হলেও বাংলা একাডেমীতে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিভিন্ন পুঁথি থেকে এর বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 'ভ্রাতৃবিলাপে রহীমুন্নেসা' এজাতীয় বারমাসীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দুটি সহোদর-সহোদরার প্রগাঢ় পারিবারিক সম্প্রীতির সংবাদ চট্টগ্রামের মহিলা কবির স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতায় উপস্থিত। কিছুটা উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে :

না দেখি এ চন্দ্রমুখ টুক্ টুক্ হৈল বুক
তোহ্মা খেদে স্থির নহে প্রাণী।
না পুরিতে কলানিধি কেন ক্ষয় হয় বিধি
কদাপী না মিটে কর্মভোগ।
না কৈল্যা সংসার সুখ প্রভু তোহ্মা করাউক
স্বর্গপুরী হুরের সম্ভোগ॥
আশ্বিনেতে খোয়ামর (শিশির) কান্দে তরুলতাচয়
ভাই বলি কান্দে উভরায়।
আমার কান্দনি শুনি বনে কান্দে কুরঙ্গিনী
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায়॥

বিরহবর্ণনা-মূলক বারমাসীর মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী রয়েছে, যেখানে, পল্লীগীতির ধূয়ার মত একই চরণের পুনরাবৃত্তি প্রতিটি মাস-বৈশিষ্ট্য-বর্ণনার পরে এসেছে। পল্লী ও মফস্বল অঞ্চলে দেখা যায়---এই বিরহ-প্রধান বারমাসীই সেখানকার মেয়ে মহলে অধিক গীত হয়ে থাকে। তবু বারমাসীগুলির শব্দচয়নে কবিত্ব বা শব্দালঙ্কার, শ্রোতা ও পাঠক-

গণকে ক্ষণিকের জন্য হলেও মুগ্ধ করে। ---লোকসাহিত্যের বাইরে শালীন সাহিত্যের আসরেও এই বারমাসী সমাদৃত :

মধুমাসে মধু ঋত মধুরে মধুর।
মাধবী মালতী মালী বিকাশে প্রচুর
মলয়া পবন পরিমল বহে মন্দ।
মধুকর ঝঙ্কারএ পিয়ে মকরন্দ॥

['মেহের নেগারের বারমাসী', শাহ্ বারিদ খান]

সাধুবাংলা, আঞ্চলিক ও কথ্যবাংলায় রচিত কোন কোন বারমাসী একাধিক অঞ্চলে বর্তমান। শ্রীসুধাংশুভূষণ রায় এরকম একটি বারমাসীর কথা বলেন, যা ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত ('সৌরভ' ১৫-শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৩৪, পৃ. ২৬৪) পরিসংখ্যানে জানা যায় বারমাসীটি শুধু ময়মনসিংহ নয়, বর্তমানে লোকগীতিকা-রূপে দিনাজপুর, রাজশাহী এবং রংপুর অঞ্চলেও প্রচলিত---

কত পাষ্যণ বাইন্ধাছ বন্ধু বৈদেশে বৈদেশে...
জ্যৈষ্ঠ মাসে মিস্ট ফল আষাঢ় মাসে নতুন জল
শ্রাবণ মাস কাটাইল নারী নাইয়রে, আরে নাইয়রে

৬. অধ্যাত্ম-সাধনার বা ভক্তের বারমাসী

আমরা এতক্ষণ দেখেছি, কৃষ্ণের প্রেমের আধ্যাত্মিক রূপকে, প্রাচীন সাহিত্যে, বেশ কিছু বারমাসীর পাণ্ডুলিপি (প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত) পাওয়া যায়, যে-গুলি খণ্ড-কবিতার আকারে গ্রথিত। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের অধ্যাত্ম-লীলার বারমাসী বিরহ-বর্ণনামূলক বারমাসীরও সগোত্র। সেকারণে, এই ধারায়, ইসলামী তাসাউদ, সুফীভাবতত্ত্ব বা বাউল সাধনার বারমাসী বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আবার, কাহিনী কাব্যের বাইরে, অন্য একটি বারমাসী 'উড়ে এসে জুড়ে বসার' মত, কোন কোন পাণ্ডুলিপির মধ্যে গ্রথিত হয়েছে। ইউসুফ জোলেখার কাহিনীতে বিধু-প্রভার কাহিনীর মত (বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালায়) যেমন, 'হানিফা ও

কায়রাপরী' উপাখ্যানের পুঁথিতে সাবিরিদ খান রচিত 'জৈগুণের বারমাস' রয়েছে (ক্রমিক ৪৮১।। পুঁথি ৩৪৮)। উক্ত গ্রন্থগারের পুঁথিসমূহ পরীক্ষায় জানা যায় রাধার বারমাস হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিই রচনা করতেন। যেমন, কমর আলীর 'রাধার বারমাসী' (দ্র. ক্রমিক ২৬৫।। পুঁথি ৩০১)। আহমদ শরীফের মতে, এই বারোমাসীর রচয়িতা কমর আলী পণ্ডিত 'উনিশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। ইনি সঙ্গীত শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন"। এই পুঁথিতে প্রথমে 'রাধার বারমাস' ও পরে কয়েকটি বিরহ-সঙ্গীত রয়েছে। অভিনব শ্রেণীর বারমাসীর মধ্যে রয়েছে মুরীদের উদ্দেশ্যে রচিত ভক্তের বারমাসী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগারের সংগ্রহ নং ৪১৮ আ. ক. সং. ৫৫৩)। এতে সাধারণ জন-চিত্তের অধ্যাত্ম-ব্যকুলতা সরল ও সাদা-মাটা ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে :

আকুল সমুদ্র মাঝে মুর্শীদের বাজার।
মোকাম মোকাম মধ্যে নায় বসাইলা বাজার।।
উম্মতে করিছে গুনাহ্ নবী বেয়াকুল।
সবে বলে মুর্শীদ মুর্শীদ কেমন জনে।
ধড়ের মাঝে আজে মুর্শিদ কেমনে কৈব আমি কেমনে।।
আঘ্রণ মাসেতে মুর্শীদ শুন মোমিন গণ।
কোন খেনে সাধু গেল লঙ্কার ভুবন।।
কোন কোন সাধু যায় বাণিজ্য করিবার।
পবন বুঝিয়া নৌকা ধরিবা কাণ্ডারী...
মাঘল মাসেতে মুর্শীদ কবে নয়া খাই।
মা বাপ সেবিলে পাইবা আখেরে ভালাই।।

আলোচ্য বারমাসীসমূহের সবগুলোতেই কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন, প্রায় সব বারমাসীতে অগ্রহায়ণ থেকে বৎসরের প্রারম্ভ কল্পনা করা হয়েছে। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে--অগ্রহায়ণ মাস ধান পাকার সময়। এ মাসেই সচরাচর গ্রামবাংলায় নবান্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মুর্শীদের বারমাসী-তে রাধাকৃষ্ণ অনুষঙ্গেও আধ্যাত্ম এবং দেহাত্মতত্ত্ব একাত্ম হয়ে বাউল ও সুফী-ভাবব্যঞ্জনাকে মিলিত ও ব্যক্ত করেছে--

ফাল্গুন মাসেতে মুর্শীদ জায়া ভয়ঙ্কর।
কোন পন্থে গেল মুর্শীদ--না পাইলাম উত্তর॥
ভরমিতে ভরমিতে মুর্শীদ তনু হৈল শেষ।
তবে সে না পাইলাম মুক্তি মুর্শীদের উদ্দেশ॥
উপরে ধবল ছত্র টঙ্গীর নীচে পানি।
তার মাঝে আছে মুর্শীদ এই উদাসিনী॥
চৈত্রল মাসেতে মুর্শীদ কূলের ভারতী।
মথুরা যুবতী করে এথেক দুর্গতি॥
বৈশাখ মাসেতে মুর্শীদ ভ্রমি তোহ্মা নিত।
বুঝিতে না পারি মুর্শীদ তোহ্মার চরিত॥

চ. পরীক্ষামূলক বারমাসী

এ-জাতীয় বারমাসীতেও বছরের বিভিন্ন মাসের বৈশিষ্ট্যবর্ণনার পটভূমিতে নায়ক-নায়িকার হৃদয়াবেগ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু একটু নতুন ভাবে এবং নতুন ভঙ্গীতে। আট নয় বৎসরের বালিকা বধূকে ছেড়ে স্বামী দূর প্রবাসে চলে যায়। কয়েক বছর পরে, প্রবাসী স্বামী দেশে ফিরে এসে আত্ম-পরিচয় গোপন রেখে, ভিন্ন পুরুষের বেশে স্ত্রীর কাছে প্রণয় নিবেদন জানায়। বিভিন্ন মাসের পটভূমিতে স্বামী সতীত্ব পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে। ময়মনসিংহ গীতিকার 'শান্তির বারোমাসী' ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলার কয়েকটি বারোমাসী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে সমস্ত কাহিনী কবিতার আকারে রচিত হয় না। এর চেহারা হয় উক্তি-প্রত্যুক্তি আকারে গ্রথিত---অনেকটা কাব্য-নাট্যের মত। বৈশাখ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত স্বামী নিজের স্ত্রীর নিকট ভিন্ন প্রণয়ীর অভিনয় করে ছদ্মবেশে থেকে, অবশেষে চৈত্র মাসে ধরা দেয়। তবু অবুঝ স্ত্রীর প্রতীতি জন্মায় না। তার পিতামাতার কাছ থেকে সে প্রকৃত স্বামীর বয়স, ঠিকানা, মুখাকৃতি, বর্ণ, ইত্যাদি জেনে নিয়ে, তাকে পরখ করবার জন্য অভিভাবকের কাছে নিয়ে আসে। ঘটনার আকস্মিক পরিণতি এ বারমাসীতে একটা কৌতূহল সৃষ্টি করে বলে, এগুলি পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে মেয়ে-মহলে, খুবই জনপ্রিয়। অন্য জাতীয় বারোমাসীতে নায়ক-নায়িকার প্রতীক্ষা-বর্ণনা মুখ্য হয়---এখানে তা নয়। এখানে নায়ক-নায়িকার

প্রশ্নের মধ্যে থাকে পরীক্ষা, অনেকটা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত 'সওয়াল সাহিত্যে'র রীতিতে।

ছ. ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখমূলক বারমাসী, স্বাস্থ্যের বারমাসী বা জৈব বারমাসী

আর এক ধরনের বারমাসী দেখা যায়, যাতে বিরহ বা বিচ্ছেদ নয়——সারা বছরের অভাব-অনটনের কথা বিবাহিতা স্ত্রীর জবানীতে বর্ণিত হয়েছে। কবি মুকুন্দরামের (১৬-শ শতক) চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরার বারমাসীকে এ-জাতীয় বারমাসীর শ্রেণীভুক্ত করা যায়। প্রেমিকার জবানীতে এ-জাতীয় বারমাসী রচিত হতে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

স্বাস্থ্যের বারমাসী'তে বাঙ্গালীর চিরায়ত রসনা-বিলাস, খাদ্য-রুচিতে পুষ্টিবিজ্ঞানের চারিত্র্য আবিষ্কার, পানীয় ও ভোজ্য বস্তুতে রোগ-প্রতিষেধক গুণাগুণ নির্ণয় করা হয়েছে। পরিবেশ-জাত এবং সহজলভ্য খাদ্য গ্রহণের জন্য কবি বলেছেন:

বার মাসে বার ফল।
যে না খায় ঠ্যাঙ্গের তল॥
চৈত্রে গিমা তিতা।
বৈশাখে ঘিরত নালিতা॥
জ্যৈষ্ঠে খই।
আষাঢ়ে দই॥
শাওনে ঘোল, পান্তা
ভাদ্রে তালের পিঠা।
আশ্বিনে শশা মিঠা॥
কার্তিকে কচু, ওল।
আঘণে খলিসার ঝোল॥
মাঘে তেল।
ফাল্গুনে গুড়, আদা বেল॥

[সৌরভ', ১৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা পৃ. ১৯৬ 'প্রবাদের আবাদ'-ষষ্ঠ, চাষ]

কবির কাব্য-কৌশল ও আঙ্গিক-কুশলতা প্রদর্শনের জন্য এক ধরনের বারমাসী মধ্যযুগে রচিত হতো, যা-চৌতিসার মত প্রতিটি বর্ণকে আদ্যাক্ষর রূপে পুনঃপুনঃ বিন্যস্ত ও ক্রমধারা অনুযায়ী সাজিয়ে রচিত। একটি উদাহরণ দেয়া যায়---

চৈত্র্যমাস উপস্থিত বৎসর পূরণ।
চপলে চাতক পক্ষী প্রিয়ার কারণ॥
চাঁচর চিকুর মোর বিথুরিত কেশ।
চাঁদ বিনে চকোর গণিতে প্রাণ শেষ
চপল এ প্রাণ মোর প্রাণনাথ বিনে।
চলিমু যথাতে প্রভু চঞ্চল গমনে॥

[বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৮ শ খণ্ড, পৃ. ১৩৬]

বারমাসী-সাহিত্যের আরও কতকগুলো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো: উৎসব, অনুষ্ঠান বা খাদ্যের বর্ণনায় সাদৃশ্য বা বৈচিত্র্যহীনতা। যেমন---পৌষ মাসের শীতের শুরু বোঝাতে বারমাসীর কবি বলেছেন 'পৌষ অন্ধকার'। আবার চৈত্র-বৈশাখ মাসের রৌদ্রের 'দাহে শরীর হৈল কালা', 'জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল ও আষাঢ়ে বরিষার জল', 'ভাদ্রে তালের পিঠা/আশ্বিনে শশা মিঠা', অঘ্রাণ-পৌষে 'নবান্ন' ও শীতের প্রকোপ, জ্যৈষ্ঠে আম-কাঁঠালের মধুমাস—ইত্যাদি।

সমস্ত কবির রচনায় এ-ধরনের বিভিন্ন মাস সম্পর্কে বাঁধাধরা গৎ থাকা সত্ত্বেও বারমাসী, বিশেষ করে, প্রাচীন, মধ্য, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বারমাসীতে এমন কয়েকটি স্তবকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাতে উপমা, রূপক ও প্রতীকধর্মে সচেতন শিল্পীমনের সজাগ স্পর্শ অনুভব করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অবিভক্ত বাংলাদেশের জীবন যাত্রা-পদ্ধতির একটি প্রকৃতি-নির্ভর ও ফসল-নির্ভর বিশিষ্ট পরিচয় বিধৃত হয়েছে এসব বারমাসীতে। মধ্যযুগের প্রায় কাব্যেই নায়িকার রূপ-বর্ণনা বা স্তুতি বর্ণনার মত বারমাসীও কাব্যের আবশ্যিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হত। অধ্যায় বা অঙ্গ-সৌষ্ঠবের বিষয় বলে বারমাসী কবিদের চিন্তায় বিশেষ স্থান জুড়ে বসতো।

অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যেও এ-ধারাটি লুপ্ত হয়নি। বিশেষ করে, দো-ভাষী পুঁথি সাহিত্যে এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমানেও লোক-গীতিকার অঙ্গ হিসাবে, বারোমাসী সাহিত্য টিকে আছে।

দীনেশচন্দ্র সেন বা শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য রচিত ও সংকলিত আলোচনা গ্রন্থে প্রধানত হিন্দু কবিদের রচিত বারমাসীর উল্লেখ আছে; পূর্ববঙ্গের লোকসাহিত্যের বা মুসলমান কবির রচিত বিশিষ্ট বার-মাসী, তার আলোচনা বা অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি সেখানে স্থান পায়নি। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গায়েন, কথক এবং বিভিন্ন লেখকের রচিত যে সমস্ত বারমাসী পল্লীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুলোর সুসংবদ্ধ সংগ্রহ এবং সৎসমালোচনা বর্তমানে আশু-প্রয়োজন।

আমাদের বাংলাদেশের লোকচেতনার সংলগ্ন এই বিশিষ্ট ধারা 'ঋতু' বা আবহ-বিষয়ে 'বারমাসী-সাহিত্য' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। শুধু সাহিত্যরসিকদের কাছেই নয়, সমাজতত্ত্ববিদ্ মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ্-এর কাছেও তার মূল্য কম হবে না।